পরম অমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

মাহবুব রুবাইয়াৎ

১৯৬১ সালে এই অঞ্চলে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ) নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর প্রস্তাব ওঠে। ঢাকার ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে পাবনার রূপপুরকে বেছে নেয়া হয়। ১৯৬৩-এর দিকে সেই লক্ষ্যে জমিও অধিগ্রহণ করা হয়। কাজ খুব একটা এগোয়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সেই খোয়াব সরকার আবার দেখে ১৯৮০-তে এবং ১২৫ মেগাওয়াটের একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। বিদ্যুতের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং সেই সাথে খোয়াবও ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। ১৯৯৯-এর তৎকালীন সরকার তার নিউক্লিয়ার খোয়াব বাস্তবায়নের কথা জোরেশোরে প্রচার শুরু করে। ২০০১-এ একটি National Nuclear Action Plan প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৫-এর দিকে চীনের সাথে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তির কথাও আমরা ঐ সময় শুনতে পেয়েছিলাম। ২০০৭-এ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দুটি ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর রূপপুরে বসানোর প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে সময়সীমা ধরা হয়েছিল ২০১৫ এবং উল্লেখ করা হয়েছিল, ৬০০ মেগাওয়াটের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের আনুমানিক খরচ ০.৯ থেকে ১.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ১০০০ মেগাওয়াটের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০০৮-এ বাংলাদেশ সরকার চীনের সাথে এ ব্যাপারে কাজ করার আগ্রহ দেখায় এবং চীনও এই প্রকল্পে অর্থায়ন করতে রাজি হয়। নিউক্লিয়ারের আন্তর্জাতিক মুরব্বি International Atomic Energy Agency (IAEA) রূপপুর প্রকল্পের অনুমোদন দেয় এবং ২০০৯-১১-এর মধ্যে একটি ১১০০ মেগাওয়াটের রিঅ্যাক্টর বানানোর খোয়াবে বাতি জ্বালায়। চীনের সাথে আর হয়ে উঠল না, হলো রাশিয়ার সাথে। অবশ্য লাইনে চীন, রাশিয়ার সাথে দক্ষিণ কোরিয়াও ছিল। তারা এমনকি সমস্ত রকম আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়ার কথাও বলেছিল। সবশেষে বাংলাদেশ সরকার রাশিয়াকেই বেছে নেয়। ২০০৯ সালের এপ্রিলের দিকে ২ বিলিয়ন ইউএস ডলার খরচে রূপপুরে ১০০০ মেগাওয়াটের রিঅ্যাক্টর বসানোর রাশিয়ান প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকার সাড়া দেয় এবং বছর যেতে না যেতেই ২০১৭-এর মধ্যে এ রকম আরো একটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমাদের মহান সংসদে ২০১২ সালের মে মাসে একটি নিউক্লিয়ার এনার্জি বিল উত্থাপিত হয়। সেখানে ২০১৩ সালে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ শুরু করার কথা বলা হয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার স্বপ্নের কথা বলা হয়। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা সেদিন এটা নিয়ে আর কোনো আলোচনা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই।

রোসাটাম (Rosatam)-এর সাথে চুক্তি অবশ্য এর আগেই ফেব্রুয়ারি ২০১১-তে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর পর থেকে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে নানা পর্যায়ে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে থাকে। এর মধ্যে ২০১২-এর আগস্ট মাসের কথাবার্তা থেকে জানা যায়, রাশিয়া প্রথম পর্যায়ে ডিজাইন, কারিগরি ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৩% সুদে) এবং নির্মাণকালীন পর্যায়ে দ্বিতীয় দফায় ১.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ সরবরাহ করবে। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ঋণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। সেটি থেকে আরো জানা যায়, ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ (সুদসমেত) শোধে বাংলাদেশ সময় পাবে ১২ বছর (৫ বছর গ্রেস পিরিয়ড) এবং ১.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার শোধে সময় পাবে ২৪ বছর (১০ বছর গ্রেস পিরিয়ড)। অন্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি, এই ঋণ সব মিলিয়ে ১০ বিলিয়ন ইউএস ডলার পর্যন্ত হতে পারে।[১] প্রথম রিঅ্যাক্টর বসানোর কাজ ২০১৫-তে শুরু করে ২০২০-এ শেষ হওয়ার কথা। এরই মধ্যে এই বছর জুন মাসে আমরা খবর পেয়েছি, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ২০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপনের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার এবং পরমাণু শক্তি কমিশন জাপানের পরমাণু শক্তি কমিশনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।[২] অথচ আমাদের জানা মতে, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রে সংঘটিত সবচেয়ে বড় দুটি ঘটনাই ঘটেছে এই দুটি দেশে। একটি ১৯৮৬ সালে চেরোনবিলে (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত) এবং অন্যটি ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমায়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন মাত্রার দুর্ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। কিন্তু আমরা যতবারই এটা নিয়ে কথা বলেছি, ততবারই আমাদের বলা হয়েছে, এগুলো সব পুরনো জেনারেশনের রিঅ্যাক্টর। এখন যে প্রযুক্তি চলে এসেছে, সেটিতে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা খুবই কম এগুলো পুরোপুরি মিথ্যে কথা।

তৃতীয় (এবং তৃতীয়+) প্রজন্মের রিঅ্যাক্টরগুলোর মধ্যে আছে Advanced Boiling Water Reactors (ABWR), Pressurised Water Reactor (PWR), Advanced Candu Reactor (ACR-1000), High Temperature এধং Reactor (HTGR), Pebble Bed Modular Recator (PBMR)। এগুলোর কোনোটিই শতভাগ ঝুঁকিহীন নয়। চতুর্থ প্রজন্ম তো এখনো কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। বাজারে আসতে আসতেও নাকি ২০৩০-এর মতো লাগবে। এবং সেটি যখন বাজারে আসবে তখন আপনি শুনতে পাবেন, এগুলো একেবারেই ত্রুটিমুক্ত ও তৃতীয় প্রজন্মের থেকে উন্নততর, ঠিক যেমনটি বলা হয়েছিল তৃতীয় প্রজন্ম বাজারে আসার সময় দ্বিতীয় প্রজন্ম সম্পর্কে। তার মানে আমরা এখন প্রশ্ন করতেই পারি যে, তৃতীয় প্রজন্মের ত্রুটিগুলো (যে কারণে চতুর্থ প্রজন্মের আগমন) তাহলে কেন আগে ধরা পড়েনি? আসলে প্রযুক্তি এভাবেই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যায়। একটি প্রযুক্তি উৎপাদনে গেলেই তার সীমাবদ্ধতা, ডিজাইনগত ত্রুটি এবং বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা জানতে পারি। আর ঠিক সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই আমরা প্রযুক্তির পরবর্তী প্রজন্মে যাই। কিন্তু এখানে যে দিকটা আমাদের খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে অন্য প্রযুক্তি থেকে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির প্রায়োগিক পার্থক্য।

সব প্রযুক্তিতেই যে কোনো ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনা কেবল আর দুর্ঘটনা থাকে না। সেটি হয়ে দাঁড়ায় বিপর্যয়, মহা বিপর্যয়। থ্রি-মাইল আইল্যান্ড, চেরোনবিল ও ফুকুশিমা যার সাক্ষী। আমাদের মতো

একটা দেশের কি এ ধরনের দুর্ঘটনা সামলানোর সক্ষমতা রয়েছে? জাপান নিজেই তো এখন পর্যন্ত ফুকুশিমা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। জাপানের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কথা নিশ্চয়ই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। চেরোনবিলের ঐ সাইটটি এখনো পরিত্যক্ত। চেরোনবিলের ঘটনা এবং তার ফলাফলের যে তথ্য হেলেন ক্যালডিকটের* 'If you love this planet' বই থেকে পাওয়া গেছে সেগুলো একবার দেখা যাক–

- সোভিয়েত ইউনিয়নের ৮,০০,০০০ শিশু লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পতিত হয়েছিল।
- ইউক্রেনের ১,৬০,০০০ সাত বছরের কম বয়সের শিশু তেজস্ক্রিয়তা দূষণে থাইরয়েড ক্যান্সারের ঝুঁকিতে পতিত হয়েছিল।
- রিঅ্যাক্টরের ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে থাকা ১২,০০০ শিশুকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণে দূষিত দুধ খেয়ে ও নিঃশ্বাসে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ঢুকে জীবন বিপন্ন হয়েছিল।
- বেলারুশিয়ায় ২,৬৯৭টি গ্রামের প্রায় ২০,০০,০০০ মানুষ সাংঘাতিকভাবে তেজস্ক্রিয় দূষণের কবলে পড়েছিল।
- দুর্ঘটনার পরে যে ৬,৫০,০০০ মানুষকে (যাদের লিকুইডেটর নাম দেয়া হয়েছিল) দুর্ঘটনাস্থল পরিষ্কার করার কাজে লাগানো হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, তাদের মধ্যে ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ মানুষ তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল।
- দুর্ঘটনার পাঁচ বছর পরেও ৫০ লাখ মানুষ তেজস্ক্রিয়দূষিত এলাকায় এবং ৩ লাখ মানুষ সাংঘাতিকভাবে তেজস্ক্রিয়দূষিত এলাকায় বাস করত।

এমনকি এই দুর্ঘটনার তেজস্ক্রিয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের বহু দেশে, যেমন– পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, উত্তর ইতালি, ফ্রান্স, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো এবং ব্রিটেনের কয়েকটি অংশে। রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে আরো বড় ধরনের বিপর্যয়। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে পদ্মার ঠিক পাশেই। অতএব, দুর্ঘটনা-পরবর্তী এবং দুর্ঘটনা ছাড়াই যে কোনো তেজস্ক্রিয় নির্গমনে পদ্মা দ্বারা বাহিত হয়ে ব্যাপক অঞ্চলে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কোনোভাবেই অমূলক নয়। তাছাড়া রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছে না। ধরা যাক সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী রাশিয়াই সেটা ফেরত নিয়ে যাবে। কিন্তু রাশিয়া তো সেটা টেলিপোর্টেশন করে নিয়ে যেতে পারবে না। তাকে কোনো একটা পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করেই সেটা সমাধা করতে হবে। এতে করে যে কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে পরিবেশ তেজস্ক্রিয়তায় মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়ার ঝুঁকিও যাবে বেড়ে।

তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। সমস্ত ধরনের তেজস্ক্রিয়তাই বিপজ্জনক, কোনো তেজস্ক্রিয়তাই নিরাপদ নয়। এমনকি আপনি যখন এক্সরে করান, আপনি কিছুটা হলেও ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বাড়াচ্ছেন। অতএব, খুব প্রয়োজন না হলে এক্সরে করাটাও আপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব আপনার শরীরে ক্রমপুঞ্জিত হয়। তার মানে আপনি যদি সারা জীবন ধরে অল্প অল্প করে তেজস্ক্রিয়তায় উন্মুক্ত হন, তার ফল একবার খুব বেশি মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তায় উন্মুক্ত হওয়ার সমান। আর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষ তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। আবার তার মধ্যে ভ্রূণ, শিশু ও অল্পবয়স্ক শিশুরা আরো বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল।

সব প্রযুক্তিতেই যে কোনো ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনা কেবল আর দুর্ঘটনা থাকে না। সেটি হয়ে দাঁড়ায় বিপর্যয়, মহা বিপর্যয়। থ্রি-মাইল আইল্যান্ড, চেরোনবিল ও ফুকুশিমা যার সাক্ষী। আমাদের মতো একটা দেশের কি এ ধরনের দুর্ঘটনা সামলানোর সক্ষমতা রয়েছে? জাপান নিজেই তো এখন পর্যন্ত ফুকুশিমা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এবার আসা যাক নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রসঙ্গে। এটিতে মূলত জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ (ইউরোনিয়ামের একটি আইসোটোপ) ব্যবহার করা হয়। এই জ্বালানিচক্রের প্রতিটি ধাপই বিপজ্জনক। খনি থেকে ইউরেনিয়াম তোলার সময় র‍্যাডন নামক একটি গ্যাস বের হয়। যখন খনি শ্রমিকরা ফুসফুসে বাতাস নেয়, তারা ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। অতীতে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ইউরেনিয়াম খনি শ্রমিক ফুসফুস ক্যান্সারে মারা গেছে। ইউরেনিয়াম প্রসেসিংয়ের সময়ও যে আকরিকগুলো বাতিল হয় তা থেকেও র‍্যাডন গ্যাস বের হয় হাজার হাজার বছর ধরে। এই ইউরেনিয়াম শোধন করার পর এগুলো জ্বালানি রডের মধ্যে রেখে রিঅ্যাক্টরে রাখা হয়। রিঅ্যাক্টরের কোরের ভেতর এ রকম শত শত লম্বা সরু নলে জ্বালানি ভরা হয় এবং সবগুলো ঘেরা থাকে পানি দিয়ে। একটি বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে ইউরেনিয়াম চরম ভর অর্জন করে এবং নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার ফিশনের মাধ্যমে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসকে ভাঙা হয়। এটা থেকে প্রচুর তাপশক্তি পাওয়া যায় (আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্রানুযায়ী)। এই তাপশক্তি দিয়েই পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। এই বাষ্প টারবাইনকে ঘোরায়, যা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে বাষ্প তৈরি করার পদ্ধতিতে হেলেন ক্যালডিকট তুলনা করেছেন বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে মাখন কাটার সাথে! যথার্থ।

আবার খনি থেকে ইউরেনিয়াম উত্তোলনের সময় ইউরেনিয়ামের আকরিকে ০.১% ইউরেনিয়াম থাকে। এই ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পূর্বে একে সমৃদ্ধ করে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ বাড়াতে হয়। এই পর্যায়ে যেমন বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য তৈরি হয়, জ্বালানি রডে ব্যবহৃত হবার পরও এ থেকে তৈরি হয় বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের এক ককটেল, যার অন্যতম হলো প্লুটোনিয়াম। প্লুটোনিয়াম একটি কৃত্রিম মৌল (ইউরেনিয়াম বিভাজনের আগে এর অস্তিত্ব ছিল না)। গড়ে প্রতিটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০০ কেজির মতো প্লুটোনিয়াম তৈরি করে এবং ২০২০ সালের মধ্যে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ৩০,০০০ টনের মতো প্লুটোনিয়াম তৈরি হবে। প্লুটোনিয়াম সম্পর্কে একটি তথ্য দেয়াই যথেষ্ট মনে হতে পারে– প্লুটোনিয়াম এতই বিষাক্ত যে এর এমন কোনো সামান্য মাত্রা পাওয়া যায়নি, যা একটি কুকুরের শরীরে প্রবেশ করালে তা ক্যান্সার হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আরো যে তিনটি ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় মৌল নিউক্লিয়ার

রিঅ্যাক্টর থেকে নির্গত বর্জ্যের ককটেলে থাকে সেগুলো হলো আয়োডিন-১৩১, স্ট্রনসিয়াম-৯০, সিসিয়াম-১৩৭। স্ট্রনসিয়াম-৯০ এর অর্ধায়ু (Half life) ২৮ বছর এবং সিসিয়াম-১৩৭ এর অর্ধায়ু ৩৩ বছর। তার মানে বহুশত বছর ধরে এটা বিপজ্জনক। অন্যদিকে প্লুটোনিয়ামের অর্ধায়ু ২৪,৪০০ বছর। অর্থাৎ এটা বিপজ্জনক থাকবে ২,৪০,০০০ বছর! ততদিন পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করতে চাইলে বোধ করি আপনাকে শুধু এটুকু তথ্য দিলেই চলবে যে কৃষিকাজ থেকে শুরু করলে আমাদের এই সভ্যতার বয়স মাত্র ১০,০০০ বছর।

এবং সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, এখন পর্যন্ত এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের কোনো কার্যকর সমাধান কেউ বের করতে পারেনি। এটার আপাত সমাধান বের করা হয়েছে মাটিতে এইসব বর্জ্য পুঁতে ফেলে। এটাও ভয়াবহ বিপজ্জনক, কেননা ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পানি এটা দ্বারা দূষিত হয়ে পরিবেশে উন্মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়া ভূমিকম্পের আশঙ্কা তো সব সময়ই থেকে যায়। যে সময়কাল ধরে এই বর্জ্যগুলো তেজস্ক্রিয় থাকে তত দীর্ঘ সময়ের জন্য একে কোনো স্থানে নিরাপদে সরিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। এভাবে পরবর্তী বহু বহু প্রজন্মকে ফেলে দেয়া হচ্ছে এক ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে যেটার কার্যত কোনো অধিকার কারোই নেই।

এত কিছুর পরও তাহলে কেন নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন উঠছে এবং এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বিভিন্ন দেশে দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের রমরমা এখন আর আগের মতো নেই। এর প্রবৃদ্ধিও পড়তির দিকে, বিশেষত ইউরোপে। জার্মানি ইতোমধ্যেই তার নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ২০২০-এর মধ্যে বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর জাপানও একই পথে হাঁটছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা কেন আরেকটি ফুকুশিমা বিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করব? এমন তো নয় যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নেই। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি সমন্বয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে দক্ষতা বাড়িয়ে আমরা খুব সহজেই আমাদের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারি, যেটা নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের থেকে সস্তা, টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং কাজেই মানবিক। নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নামেই বেশি পরিচিত, কিন্তু এর বিপরীতে আমরা এগুলোকে চিহ্নিত করতে চাই পরম অমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে। আমরা এমন কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র চাই না, যা প্রাণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। যদি প্রাণই না বাঁচে, যদি মানুষই না থাকে তাহলে 'সেই বিদ্যুৎ লইয়া আমরা কী করিব'?

এমনকি এর নির্মাতারা যেটা জোর গলায় প্রচার করে থাকেন যে, নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় খুবই কম এবং এটি থেকে কোনো গ্রিনহাউজ গ্যাসেরও নির্গমন হয় না, তাই এটি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এই দাবিও সত্য থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে। পরবর্তী কোনো লেখায় এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনার আশা রাখি।

এখন পর্যন্ত এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের কোনো কার্যকর সমাধান কেউ বের করতে পারেনি। এটার আপাত সমাধান বের করা হয়েছে মাটিতে এইসব বর্জ্য পুঁতে ফেলে। এটাও ভয়াবহ বিপজ্জনক, কেননা ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পানি এটা দ্বারা দূষিত হয়ে পরিবেশে উন্মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়া ভূমিকম্পের আশঙ্কা তো সব সময়ই থেকে যায়। যে সময়কাল ধরে এই বর্জ্যগুলো তেজস্ক্রিয় থাকে তত দীর্ঘ সময়ের জন্য একে কোনো স্থানে নিরাপদে সরিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। এভাবে পরবর্তী বহু বহু প্রজন্মকে ফেলে দেয়া হচ্ছে এক ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে যেটার কার্যত কোনো অধিকার কারোই নেই।

শেষ করতে চাই হেলেন ক্যালডিকট থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে–"মহান ভালোবাসা, চমৎকার সম্পর্ক, মহান সৃষ্টি আর দারুণ শিল্পকলায় পারদর্শী হয়ে উঠতে আমাদের শত শত কোটি বছর লেগেছে। মানুষ হিসেবে আমরা এক চমৎকার প্রজাতি। যদিও আমরা এতই সুদক্ষ হয়ে উঠেছি যে পৃথিবীর সমস্ত জীবনকে মুছে দিতে আমরা শিখে গেছি। আর আমরা বোধ হয় পার্বত্য ইঁদুরের মতো সেই দিকেই এগোচ্ছি।

আমরা পৃথিবীর প্রাণের সংগ্রাহক। আমরা নিজেদের হাতের মুঠোয় তা ধরতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আমরা সময়ের একটা বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছি। যদি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র পৃথিবীজুড়ে প্রসার লাভ করে, প্রসার লাভ করবে পারমাণবিক অস্ত্র। যদি আমরা পারমাণবিক অস্ত্র থেকে মুক্তি না পাই, আমরা বাঁচব না। জন্তু, গাছপালা–কিছুই বাঁচবে না, কেননা তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আমাদের যে দশা হবে, একই দশা হবে তাদের, ওদেরও হবে ক্যান্সার আর বিকলাঙ্গতা।

সুতরাং দেখুন, সকলের একান্ত প্রয়োজন আজ উঠে দাঁড়ানোর, দরকার প্রত্যেকের কাঁধে দায়িত্ব নেয়া। এই দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। আমাদের নিজেদের ছেলেপুলের জন্যই উঠে দাঁড়াতে হবে এবং মানব প্রজাতিকে রক্ষা করতে হবে। আমি দেখেছি যে একবার যদি মানুষ বোঝে তাদের দুনিয়ার কী ঘটছে, তারা করণীয়টা ঠিক করে নেয়। আপনাদের বাচ্চাদের শুধু রোগভোগ থেকে নিরাপদ রাখার কোনো মানে নেই, কোনো মানে নেই তাদের কেবল ভালো শিক্ষা দেয়ার, ভালোবাসা দেয়ার–যেখানে তাদের ভবিষ্যৎ বলেই বোধ হয় কিছু নেই। অভিভাবক বা পূর্বপুরুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো এটা দেখা যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটা ফলপ্রসূ ও পূর্ণ জীবনের সম্ভাবনা গ্রহণ করতে পারে।"

মাহবুব রুবাইয়াৎ: শিক্ষক ও গবেষক
ইমেইল: mahbub.rubaiyat@gmail.com

তথ্যসূত্র :

১.www.themoscowtimes.com/business/article/rosatom-to-build-bangladeshs-first-nuclear-power-plant/487015.html

২. www.world-nuclear.org/info/country-profiles/countries-A-F/Bangladesh

* ডা. হেলেন ক্যালডিকট হলেন পারমাণবিক শক্তি ও অস্ত্রসম্ভার-বিরোধীদের একজন। অস্ট্রেলিয়ার এই শিশু চিকিৎসক একা গণপ্রতিবাদ সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েছিলেন। ফরাসি সরকারকে বাধ্য করেছিলেন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা বন্ধ করতে।